বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সীতানন্দ কলেজ

নন্দীগ্রাম ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের কথাসাহিত্যের বিশেষ আলোচনার জন্য প্রদত্ত গবেষনার নিবন্ধ

বিষয়ঃ

বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্পে সমাজ বাস্তবতা

গবেষক ঃ বিজয় কৃষ্ণ করন

রোল ঃ PG/VUEGS49/BNG-IIIS নং ঃ2102

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ 1490045 সাল ঃ 2018-2019

শিক্ষাবর্ষ ঃ 2022-2023

গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক ঃ

অধ্যাপক শঙ্কর নন্দী

শিরোনাম

বিষয়ঃ-

বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের নির্বাচিত
ছোটোগল্পে **সমাজ** বাস্তবতা

বিজয় কৃষ্ণ কর্মকার
.....23.03.2023.
গবেষক

23/3/23
.....
গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক

সূচিপত্র

সিরিয়াল নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	১-৩
২।	বিষয় পর্যালোচনাঃ	
	'পুঁইমাচা'	৪-৬
	'বিপদ'	৭-৯
	'তালনবমী'	১০-১২
৩।	উপসংহার	১৩-১৪
৪।	গ্রন্থপঞ্জি	১৫

ভূমিকা:-

সাধারনভাবে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায় সর্ম্পকে আমাদের ধারনা এই যে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যময়, আনন্দময় সরল রূপকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গুলোও সাধারনভাবে যেন বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জগতের আনন্দলোকে বিচরন করে। বিভূতিভূষনের সাহিত্য সর্ম্পকে এই ধারনা কোনো ভ্রান্ত ধারনা নয়, কিন্তু তা একপেশে ধারনা। বস্তুত পক্ষে বিভূতিভূষনের রচনায় তাঁর সমকালের স্বরূপের আলোকে তাঁর গল্পের বিশ্লেষনে এই সত্যটি ধরা পড়বে। এই বাস্তবতার একটি রূঢ় রূপ হল সমাজ বাস্তবতা। সেই সামাজিকতা বিভূতিভূষনের গল্পে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁর কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষন সূত্রে দেখার চেষ্টা করব। সেই সূত্রেই বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের সমকালীন সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তিরিশের দশকের বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের বাস্তবতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পটভূমি নানান বৈচিত্র্য ভরা। যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব, বিশ্বব্যাপী আর্থিক অনটন, বেকারত্ব জনিত হতাশা ও মানসিক বিপর্যয় পারিবারিক ভাঙন দারিদ্রের পীড়ন, নেতিবাচক সংশয় উদভ্রান্ত বিহ্বলতা ও রোমান্টিক স্বপ্ন সেদিনের মানুষকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। বাংলার চাষিরা সর্বস্বান্ত হল আজন্ম খরা, বন্যা এবং দারিদ্র্যে শোষনের তাড়নায়। বহুদিনের কুলানুগামী শ্রমবিভাগ পদ্ধতি বিনষ্ট হল। নিম্নমধ্যবিত্ত শহরবাসীর আশা ভঙ্গ ও জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের বেদনা প্রকট হয়ে উঠল।

জাতীয় জীবনে ব্যক্তি/দেশাত্মবোধ উদ্বোধন সহায় হয়েছে। তাই পারিবারিক জীবনে নানা রকমের সংঘাত, সংকট ও ভাঙন নিয়ে এল। নাগরিক জীবনে, মধ্যবিত্ত পরিবারে একদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, অন্যদিকে আর্থিক পরাধীনতা এই দুইয়ের বিপরীত মুখাখানে গভীর সংকট দেখা দিল। শুধু তাই নয় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা আমাদের পুরাতন সমাজের ছাঁচে আঘাত হানল। এই বাস্তব আঘাতে ও সাহস তার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে।

নূন্যতম আয়ের ভিত্তিতে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার ভিত্তিতে দারিদ্রতা কথাটি চিহ্নিত হয়। জীবন ধারন এবং নিরাপত্তার ভিত্তিতে দারিদ্র্যতা কথাটি সম্পর্কিত। বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায় সর্ম্পকে আমাদের ধারনা এই যে তিনি প্রকৃতির শিল্পী এবং জীবনের আনন্দময় রূপেই তাঁর আস্থা কিন্তু তাঁর কথা সাহিত্য নিবিড় ভাবে পাঠ করলে সামাজিক বাস্তবতা সর্ম্পকে তাঁর সচেতন শিল্পী সত্তাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি-নির্বাচিত কয়েকটি গল্পে দারিদ্র্যের স্বরূপ ও শিল্প রূপ কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করব। গল্পগুলি হল - 'তালনবমী,'পুঁইমাচা', ,'বিপদ'।

বিভূতিভূষনের সামাজিক বিশ্লেষনের দারিদ্র্য বলতে কী বোঝায় তা দেখার চেষ্টা করব। দারিদ্র্যতা হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একজন ব্যাক্তির কি আছে এবং কি থাকা উচিত এরই মধ্যবর্তী অসামান্যজনিত ধারনা। একজন ব্যাক্তির কি থাকা উচিত তা মানুষের একটি অন্তবর্তী ধারনা। এই দারিদ্র্যতা সর্ম্পকে অসামান্য জনিত ধারনা। একজন ব্যাক্তির কি থাকা উচিত - তা মানুষের একটি অন্তবর্তী ধারনা, তাই দারিদ্র্যতা সর্ম্পকে ধারনা এবং অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি থেকে পৃথক প্রকৃতির হয়। বার্টেন হেনরি দারিদ্র্যতা চিহ্নিতকরনের উদ্দেশ্যে কতগুলি সূচক ব্যবহার করেছেন। জীবন ধারনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগ, সম্পদ ধারনের অক্ষমতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং হতাশা জনিত অনুভূতি, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের প্রয়োজন। নূন্যতম অস্তিত্বের ভিত্তিতে জীবন ধারন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারনের মান নির্ভর করার স্থান ও কালের বিচার।

জৈবিক চাহিদার অপূর্নতাগুলি থেকেও সামাজিকতা কথাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ জীবন ধারন এবং নিরাপত্তার ভিত্তিতে দারিদ্র্যতা কথাটি সম্পর্কিত। তবে জৈবিক চাহিদার সঙ্গে সামাজিক চাহিদার পার্থক্য। খাদ্য,বস্তু, বাসস্থানের সঙ্গে জৈবিক চাহিদার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। অন্য দিকে সামাজিক চাহিদা হল আত্মসচেতনতাবোধ, আবেগ জনিত তৃপ্তি, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি।

বিভূতিভূষনের ছোট গল্পগুলিতে সমাজ বিষয়ক আলোচনায় দারিদ্র্যের বাস্তব রূপ, দারিদ্র্যের প্রতি উচ্চবর্গের মনোভাব,দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে এবং দারিদ্র্য সম্পর্কে লেখকের জীবন দৃষ্টির বিশিষ্টতা তাঁর গল্পগুলিতে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করব।

বিষয় পর্যালোচনা-

আমার এই প্রকল্প পত্রে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প-'তালনবমী', 'পুঁইমাচা', ,'বিপদ'-ধাপে ধাপে আলোচনা করলাম।

"পুঁইমাচা":-

দারিদ্র্যের অন্যতম লক্ষন আহারের অভাব, সেই সূত্রে খাদ্য বস্তুর প্রতি চরিত্রের আসক্তি। 'পুঁইমাচা' গল্পে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি এই লোভ ও বাসনা টুকু নিয়েই অতি দরিদ্রের সাংসারিক চিত্র চিত্রিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ সমস্যা, পরিবারের বাস্তব রূপ, পারিবারিক জীবনের সংসারের দারিদ্র্যের উজ্জ্বল লাঞ্ছিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে-বিভূতিভূষনের 'পুঁইমাচা' গল্পে।

'পুঁইমাচা' গল্পে দরিদ্র্য ব্রাহ্মন সহায়হরি চাটুজ্জে, তার স্ত্রী অন্নপূর্না এবং তাদের চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে ক্ষেন্তি এই গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র। ক্ষেন্তিকে মূল চরিত্র বলি, কারন একে ব্রাহ্মনের বাড়ির মেয়ে,বিয়ের বয়সও হয়ে গেছে। অথচ দরিদ্র্য সহায়হরির পক্ষে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হচ্ছে না। এই অপরাধে গ্রামের চৌধুরীদের চন্ডীমনজপে তাকে এক ঘরে করার কথাও আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু স্ত্রী অন্নপূর্না এই বিষয়ে যত চেঁচামচিই করুক না কোনো সহায়হইরি এবং জেষ্ঠা কন্যা ক্ষেন্তি উভয়েই এ ব্যাপারে নির্বিকার।সমাজ থাকতে গেলে সহায়হরির মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, কারন ষোলো বছরের মধ্যে বিয়ে না দিতে পারলে এই সমাজ এক ঘরে করে দেবে। এই বিষয়ে সহায়হরির কোনো মাথা ব্যাথা নেই। দারিদ্র্যের কারনে সঞ্চিত কোনো অর্থ নেই। সেই কারনে ক্ষেন্তির বিবাহে ব্যতিব্যস্ত হয়নি সহায়হরি।

"সমাজের বামনদের যদি জাত-
মারবার ইচ্ছে না থাকে
মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল"

দরিদ্র সংসারে মেয়ে বিয়ে দিতে পারে নি সহায় হরি , একদিকে কালীমায়ের - চন্ডীমন্ডপে ডাক পড়ে - মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে জাত যাবে আবার এক ঘরে করে দেওয়া হবে। উচ্চবর্গের মনভাব এসে পড়ে যেন- সহায়হরির উপর। দরিদ্র সহায়হরিকে সামাজিক প্রথা চুপ করে মেনে নিতে হয়।

ইতি মধ্যে দোজবরের বয়স্ক এক পাত্রের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই অকাল বসন্তে ক্ষেন্তির স্বামী মারা যায়। ক্ষেন্তির জীবন দৃষ্টি পরিবর্তন হয় বিবাহের পর।

"আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল,
বলেন, ও টাকা আগে দাও তবে
মেয়ে নিয়ে যাও"।

সহায়হরি পনের টাকা ঠিক মত ক্ষেন্তির শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছে না দিতে পারায় ক্ষেন্তির শ্বাশুড়ী পরিস্কার জানিয়ে দেয় আগে পনের টাকা মিটিয়ে না দিলে ক্ষেন্তি তার নিজের বাড়ী যেতে পরবে না। অন্ন পুর্নার অনুরোধ সহায়হরি ক্ষেন্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা না করিয়ে অপমান করিয়ে তাড়িয়ে দেয় ক্ষেন্তির শ্বাশুড়ী। পৌষ মাসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তাও সবার খালি হাতে, নদিকে ছোট লোকের মেয়ে হা-ভেতে ঘরের মত খাই খাই করে সারাদিন।

ক্ষেন্তির বসন্ত হওয়া কালীন তার শাশুড়ী এত-চামার যে ডাক্তার কিংবা কোন রকম একটু যত্ন করেনি। উলটে ক্ষেন্তির পরনে সোনার জিনিস খুলে নেয়। কালীঘাটে পূজো দিতে এসে দূর সম্পর্কের কোন বোনের সন্ধান পাওয়ায় ক্ষেন্তিকে সেখানে ফেলে চলে যায়। সেই খানে চিকিৎসা না হওয়া ক্ষেন্তি অল্প দিনে মারা যায়।

প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভুষন বন্দোপাধ্যায় বোধ হয় তাঁর এই গল্পটির অনবদ্য সমাপ্তির মাধ্যমে দেখতে চেয়েছেন যে, এই সমাজ এবং সংসার সাধারন মানুষের তুচ্ছ আশা এবং আকাঙ্খাকে ও পূর্ন করে না, কিন্তু প্রকৃতিপূর্ন করে। তাই ক্ষেন্তি অনাদরে এবং অবহেলায় চলে গেছে, কিন্তু তাঁর পোঁতা পুঁতি পরা ক্রমশই -"সুপুষ্ট ,নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবন্যে ভরপুর"।

গল্পটির কৃতিত্ব- হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি উজার করে লেখা।পিতা মাতা এবং ছোট বোনে মিলে যখন এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে তাদের বাড়ির উপেক্ষিত, লাঞ্ছিতা এবং লোভী বড় মেয়েটির হাতে পোতা নবধূর পুঁই গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকে তখন করুন রসসিক্ত এক অপরূপ মানবিক মুহূর্ত রচিত হয়।

"বিপদ"

সমাজের সমস্ত দিক থেকে অবহেলিত এবং অধঃপতিত রমনীর মধ্যেও যে স্নেহ, মমতা এবং ভালোবাসা আছে। ইক্ত গল্পের মাধমে বিভূতিভূষন তাই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। আসলে কোন চরিত্রে কুৎসিৎ বা ঘৃন্য দিকটি বিভূতিভূষনের কাছে কখনোই বড় হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে তা একেবারেই ঘটেনি। তাই "বিপদ" গল্পের নায়িকা হাজু গনিকবৃত্তি অবলম্বন করলেও যে লেখকের সহানুভুতির পাচত্র হয়েছে। একটি পতিতাকে নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে, কিন্তু কথা সাহিত্যিক এখানে কোন পতিতার জীবন কাহিনী অঙ্কন করেননি।

'বিপদ' গল্পের সূচনাতে লেখকের সঙ্গে রামচরনের মেয়ে হাজুর পরিচয় হয়েছিল লেখকের ছেলে বেলার বন্ধু ছিলেন রামচরন। হাজু ষোলো মতের বছরের একজন অনাথ গ্রাম্যবধূ মাত্র। একটি সন্তান হয়েছে তার। শ্বশুর বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ার জন্য সেখানে সে থাকে না, বাপের বাড়িতেই তাদ দু বছরের সন্তানটিকে নিয়ে একদিন লেখকের বাড়িতে কাজ চাইতে এবং ভিক্ষা চাইতে আসায় পরিচয় হয়েছিল লেখকের সঙ্গে।

"রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুসুস আগে, আমাদের বাড়ী ভিক্ষে করতে গিয়েছে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড়ভরে কাঁচা থাকা ঝাল চুরি করেছে, প্রায় পোয়াটাক।.....সে দিন কিছু বলিনি আজ রাগ সামলাতে পারিনি দাদা মেরেছি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।"

প্রকৃতি পূর্ন সব্জিভান্ডারের সামনে কাঁচা ঝাল একটি তুচ্ছ জিনিস। সামান্য চুরির দায়ে হাজু তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। দরিদ্র হাজুকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে উচ্চবর্গের মনোভাব। হাজু খেতে গেলে খুশি হয়। মন্বন্তর কালীন সময়ে একমুঠো চাল কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না। চাল, সব্জী-আকাশ ছোঁয়া দাম। তাই হাজু আর গ্রামে ভিক্ষে করতে পারেনি। তাকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরোতে হয়।

তবে অধিক মন্বন্তর এর কারনে হাজুর ভিক্ষে করা বন্ধ হয়ে গেল। তার পেট চালানো এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে সে পতিতালয়ের একজন হয়ে ওঠে।

দারিদ্রের জন্য একবেলা পেট পুরে খেতে পারেনি। মন্বন্তরের কারনে গ্রামে থাকলেও ভিক্ষে পাওয়া যায়নি। তাই পতিতালয়ে নাম লেখাতে রুচিতে বাঁধেনি তার। এখানে জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন হয়েছে হাজুর। এখন সে দু বেলা পেট পুরে খেতে পায়, হাজু এখন শহরের মটা হয়েছে। তবে মন্বন্তর চলে গেলেও গ্রামের পথের ধারে দু একটা কঙ্কাল খখনো দেখা যায়।

এরপর লেখকের সঙ্গে হাজু দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয়নি। আর এই নতুন জীবিকার কথাও তিনি জানেন না। মহকুমা শহরের একটি পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করে ফেরবার পথে অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে হাজুর দেখা। লেখক সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে নিজের জীবিকার সম্বন্ধে হাজুর মনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ নেই।

"যেন সে জীবনের পরম স্বার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সে জন্য সে গর্ব অনুভব করে।"

সমাজের অধঃপতিত, দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি বিভূতিভূষনের সহজাত ছিল। তাই তাঁকে হাজু চরিত্রটি সর্ম্পকে নতুন করে চিন্তা করতে হয়নি। ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের যন্ত্রনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হাজু কে শেষ পর্যন্ত এই ঘৃন্য জীবিকা গ্রহন করতে হয়েছিল। এই গনিকাবৃত্তি অবলম্বন করেই তার উদরের ক্ষুধা মিটেছে, জীবনের অনেক অপূর্ব বাসনা পূর্ন হয়েছে। তাই লেখকের পক্ষে তাকে দোষ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং মানব জীবনের সর্ম্পকে একটি গভীরতর প্রশ্ন তাঁর মনে ধ্বনিত হয়েছে,-

"সে কখনো ভোগ করে নাই তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতেষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিনী, আজ ও পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে। কাল যে পরের বাড়ী চাইতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে-যার বাবাও কোন দিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।"

এর মধ্যে ধিক্কার নেই, অনুযোগ নেই, ভাবালতার অবকাশ মাত্রও নেই। কোন সমাজ সচেতনতার বিশিষ্ট উদ্দেশ্য এর অন্তরালে নিহিত নয়। স্বাভাবিক সূর্যালোকের মতই এক সত্যবুদ্ধি বিভূতিভূষনের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। মানুষ সম্পর্কে লেখকের এই ঔদার্যবোধই এখানে কলঙ্কিনী হাজুকে আমাদের পরশ সহানুভূতির পাত্র করে তুলে। এবং হাজুর দেওয়া পাঁচটি টাকা লেখক হাজুর মায়ের কাছে পৌছেদেন।

"তালনবমী":-

বাংলাদেশের এক পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র গৃহস্থের দুই আহার্য লোলুপ বালকসন্তানের নিমন্ত্রনের প্রত্যাশা এবং আশা ভঙ্গের ব্যর্থতার করুন কাহিনী এই গল্পে উপজীব্য বিষয়। সারাদিনে দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। যজমারর চলে দিয়ে যতদিন চলে, তাও আবার ফুরিয়ে গেলে অনাহারে থাকতে হয়। অন্যের বাড়ির নেমন্তনের আশায় দিন চলে, নেমন্তন্ন পেলে এরা খুশি। এক বেলা পেট পুরে খেতে পাওয়া আনন্দের। কিন্তু এখানে তাদের আশা আকাঙ্খা ক্ষুধা দুইই ব্যর্থ হয়।

'তালনবমী' গল্পে ভাদ্র মাসে বর্ষার কারনে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাড়িতে দু-দিন হাঁড়ি চড়েনি। তাই অনেকদিন ধরে অনাহারে দিন চলছে তাদের।

সামান্য আয়ের গৃহস্থ ক্ষুদিরামের পক্ষে সারাবছর সন্তানদের দু বেলা পেট পুরে খেতে দেওয়া সম্ভবপর নয়। বর্ষার কারনে গ্রামের অনেক বাড়িতে উনুন ধরে নাই, কারোর বাড়িতে চলে নেই আবার কারোর বাড়িতে মাথায় ছাদ নেই। অনাহারে দিন কাটে গ্রামের মানুষদের। গোপাল ও নেপালের ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করে। অভাবের সংসারে পেট ভরে খেতে পায় না তারা তাই সংসারের উপর বিরক্ত হয়ে উঠে তারা।

এমন সময় চুনির কাছে জানতে পারে জটি পিসিমার বাড়ীতে তালনবমীর ব্রত আসছে। গাঁয়ে নিমন্ত্রন পড়বে। গোপাল এবং নেপাল দুই ভাই ভাবে তাদেরও নেমন্ত্রন করা হবে তাই তারা আশা আকাঙ্খায় ভরপুর হয়ে পড়ে। নেমন্তন্ন পেলে এরা খুশি।

"এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকান্ড তালদীঘী, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে। জটি পিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী, গ্রামসুদ্ধ ছেলে মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসিমা।

পিসিমা বললেন,"কি রে?"

"তাল নেবে পিসিমা?"

"হ্যাঁ,নেব বই কি , আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার"।

ঠিক সেই সময় নেপালের পিছনে গোপাল এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাই দাদাকে বলে, তাল এর বিনিময়ে দাদা পয়সা নিবি না। যদি পয়সা নিলে নেমন্তন্ন না করে । নেপাল একটু হিসেবি ছেলে। পয়সার বিনিময়ে কি নেনন্তন্ন করবে না এমন হতে পারে- সে শুয়ে শুয়ে ভাবে। হঠাৎ বর্ষার রাতে গোপাল বাড়ির বাহিরে আসে তাল এর সন্ধানে।

খুব ভোর বেলা উঠে গোপাল বৃষ্টির রাতে একা তাল কুড়িয়ে নিয়ে এসে জটি পিসিমার বাড়িতে হাজির হয়, বিনিময়ে সে কোনো পয়সা নেয়নি জটি পিসিমার কাছে। নেপাল ঘটনাটি জানার পর সে ছোটভাইকে তিরস্কার করে বলে পয়সা না নিয়ে তাল দেওয়াটা —

— উচিত হয়নি। কারন একটু পয়সা পেলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতে পারতো। ইহার মধ্যে গোপাল তার মাকে জিজ্ঞাসা করে আজ কি বার.....

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?"

"তা হয়তো হবে । কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার"?

অভাবের সংসারে তালনবমী উৎসব কবে খোঁজ রাখেনি গোপাল ও নেপালের মা। এদিকে, উত্তেজনায় গোপালের চোখে ঘুম আসে না। রাতে সে জটি পিসিমার বাড়িতে মহাসাড়ম্বরের সঙ্গে ভোজ খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এমন সময় মায়ের হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙে গোপালের। তারপর সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলবার এসে যায়। ক্রমশ বেলা বাড়ে গোপাল নেমন্তন্ন পাওয়ার আশায় বসে থাকে। কিন্তু নেমন্তন্ন আর জোটে না।

দরিদ্র ব্রাহ্মন বলে উচ্চবিত্ত ধনী পরিবারের তরফ থেকে নেমন্তন্ন পাওয়া আর হয়নি গোপালের। ক্ষুদিরাম ভট্টচাজ্যের পরিবারকে অবহেলা করা হয়েছে উচ্চবিত্ত ধনী পরিবার দ্বারা। সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে দারিদ্র্যের কারনে।

" ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল চলে এসে পড়লো- বোধ হয় সংসারের অবিচারে দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে। কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল!"

জীবন দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। গ্রামের এই সমস্ত দরিদ্র এবং অর্ধাহারী দারিদ্র বালকগুলির প্রতি লেখকের সহানুভূতি। একটি বড় কারনহল তাদের মনে এখন ও কৌতুহল আছে, জিজ্ঞাসা আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেদনাবোধও আছে।

"সেই দিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক দারিদ্র্য ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ।"

আনন্দ - সুখভোগ জীবনের চিরন্তন শ্বাস। সন্ধ্যার পূর্বে ও গোধূলিবেলায় সুপ্রভাতের আভাস পাওয়া যায়। তাই গল্পকার দুঃখ দুর্দশাকেই একমাত্র সম্পদ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

উপসংহার:-

বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের গল্পে রূঢ় বাস্তব চিত্র অঙ্কনের তাগিদে দরিদ্র প্রসঙ্গটি আসেনি।এ ক্ষেত্রে সমাজে দারিদ্র সত্ত্বেও মানব সত্তার চিরন্তন স্বরূপের অম্লান মাধুর্য ও জীবনাকাঙ্খা বিভূতিভূষনের গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পে দেশকালের পটভূমি আয়তক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আছে। বস্তুত প্রকৃতি বা বিস্তৃত ব্যঞ্জনা নয়, বাংলাদেশের গ্রামীন জীবন গড়ে মুখ্যত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ আনন্দবেদনার কথা বলেছেন বিভূতিভূষন তাঁর গল্প সাহিত্যে।

বিভূতিভূষনের বিশিষ্ট গল্পগুলি বিশ্লেষন করলে জীবন জগৎ ও মানুষ সর্ম্পকে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গির কয়েকটি তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত তার গল্প জগৎ তাঁর অন্তলোকের সেই সব চেতনা প্রবনতার প্রত্যয়সিদ্ধ বাস্তব রুপায়নের আকাঙ্খা থেকে জন্ম নয়েছে।অনেক ক্ষেত্রেই দেখি একটি প্রবনতা থেকে আর একটি জন্ম নিয়েছে পরস্পারের গভীর যোগে।সাধারন মানুষের বেদনা লুকায়িত সূক্ষ আনন্দ, ব্যঞ্জনা, প্রেম, স্নেহ, মমতা জীবনের চেতনা ইত্যাদি।

তাঁর দৃষ্টিতে গ্রামীন সাধারন মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার ছবি মুখ্য নয়, তাদের জীবনের ভিন্নতর মাত্রা প্রকাশ করেছেন বিভূতিভূষন। বিভূতিভূষনের গল্পে মানুষগুলি সবাই কোন সমষ্টি বদ্ধ সমাজ নয়। তারা দারিদ্র্য দুঃখ ও তুচ্ছতার আবরনে ঢাকা এমন কতকগুলি সত্ত্বা। যাদের জীবন জীবনের গভীর সঞ্চারী এক পরিচয়ের ইশারা জানায়। অবশ্য বলাবালুহ্য, এই ইশারায় আলো জ্বলে উঠেছে লেখকেরই স্বকীয় জীবন দৃষ্টির শিখা থেকে। তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে নরনারীর বাস্তব জীবন সমস্যার সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতেই। এখানেই বিভূতিভূষনের গল্পের শিল্প শরীরের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত রহস্য।

তিনি মানুষকে কোনও বিশেষ মতবাদ বা জটিলতার মধ্যে সংকীর্ন করে দেখেননি। অবশ্য মানুষের দুঃখ দারিদ্রকে তিনি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু তবু তিনি বলেছেন , মানুষ তুচ্ছ সংকীর্ন নয়, দুঃখ বেদনায় কঠিন। অগ্নি তপস্যার মধ্যেও মানুষের আত্ম অপরাজিত । তারা সীমাহীন ও শ্বাসত আনন্দের অধিকারী। মনুষ্যত্বের স্তোত্র গানে তাঁর সাহিত্যে মুখর হয়ে উঠেছে। দুঃখকে

দুঃখকে তিনি পথের বাধা বলে স্বীকার করেরনি কোথাও। দুঃখ তার কাছে অমৃত্বের পাথেয় বিশেষ। তাঁর অমৃত সন্ধানী আত্মজীবনের শত দুঃখ দুর্দশার সমুদ্র সম্ভব বিষয়টুকু নিঃশেষে পান করে সাত পীড়িত মানুষের কাছে তিনি বিশ্বাস করতেন, বাইরের আকাশে যখন বিপর্যয় আর দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসে, তখনও মানুষের সহজ আবেগ অনুভূতিগুলো মরে যায় না, সাধারন মানুষের ছোটোখাটো সুখ দুঃখের কাহিনী তখনও রচিত হতে থাকে পাড়াগাঁর দীপজ্বালা আধো আলো ছায়া, শান্ত নিরালা গৃহকোনে।

বিভূতিভূষনের ছোট গল্পে রয়েছে পল্লীগ্রামের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। সেই ছবি আমাদের অতি পরিচিত ও বাস্তব। এই বাস্তবতা মানব ধর্মে ও প্রাকৃতিক রূপে। শুধু প্রকৃতি সংলগ্ন নয়, বিভূতিভূষনের ছোট গল্পের চরিত্রগুলি অনেক বেশি প্রাকৃতিক এবং তা স্বাভাবিক। আসলে স্বাভাবিকতা এসেছে লেখকের এখন্ড জীবন বোধের জন্যই যে জগৎ তিনি এঁকেছেন ছোটগল্পে তা তাঁর চোখে দেখা একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির জগৎ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থঃ-

''মহুর্তকথাঃ বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ''। পারুল প্রকাশনী। তৃতীয় পুনর্মুদ্রন ২০১৯।

সহায়ক গ্রন্থঃ-

'কালের পুত্তলিকা'-অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়।
'বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী'-ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য।
'বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার '-ভূদেব চৌধুরী।
'বিভূতিভূষনঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা'- অরুন সেন।
'বিভূতিভূষনের ছোটগল্প, আকাশ, মাটিপাথর' -পার্থ প্রতিম বন্দোপাধ্যায়।

23.03.2023